অব্যর্থ ব্লাডপ্রেসার ও ডায়াবেটিস চিকিৎসা

ডঃ মাণিক লাল বন্দোপাধ্যায়

ব্লাড প্রেসার

রক্ত সঞ্চালন ক্রিয ১
রক্ত সঞ্চালন তন্ত্রের অঙ্গসংস্থান ও
শারীরবৃত্তিয় কার্য্য ২
হৃৎপিণ্ড ৩
হৃৎযন্ত্রের অবস্থান ৩
বাইরে থেকে হার্টের অবস্থান নির্ণয় ৩
হৃৎযন্ত্রের শারীরবৃত্তিয় কার্য্য ৪
হৃৎপিণ্ডের অন্তর্নিহিত শক্তি ৬
হৃৎপিণ্ডের শব্দ ৬
হার্টের লাবডাব শব্দের উৎস ৭
ইলেক্টোকার্ডিওগ্রাফ ও কার্ডিওগ্রাম ৮
হৃৎপিণ্ডের শব্দ ৮
রক্তচাপ ৯
নাড়ীজ্ঞান ১২
রক্তবাহী নাড়িগুলিতে রক্তচাপের পরিমান ১৪
রক্তের চাপ নির্নয় ১৫
রক্তের চাপ মাপার পদ্ধতি ১৬
প্রেসার মাপার পদ্ধতি ১৯
ডায়াষ্টোলিক চাপ ১৯
কোনরূপ যন্ত্র ছাড়া প্রেসার নির্ণয় প্রণালী ২১
সুস্থ ব্যক্তির রক্তের স্বাভাবিক চাপ ২২
সিষ্টোলিক চাপ ২৩
সময় বিশেষ প্রেসারের পরিবর্তন ২৪
রক্তচাপে ধাতুদোষের প্রভাব ২৬
শোনিত প্রকৃতির মানুষ ৩০
শোনিত প্রকৃতির লোকদের
যে লক্ষনগুলো আসে ৩১
হাইপ্রেসারে শারীরিক বিকৃতি ৩১
হাইপ্রেসারের পূর্বলক্ষণ ৩২
হাইপ্রেসারের কারণ ৩৩
ব্যাধিতে হাইপ্রেসারের প্রভাব ৩৮
বিপদজনক হাইপ্রেসার ৪০
বিপদজনক হাইপ্রেসারে আক্রান্ত
রোগীর ঝুঁকি ৪১
মৌলিকতানুসারে হাইপ্রেসারের
শ্রেণীবিভাগ ৪২
মৌলিক হাইপ্রেসার ৪৩
মৌলিক হাইপ্রেসারের বিকৃতির লক্ষণ ৪৪
মৌলিক হাইপ্রেসারের গুরুত্ব নির্ধারণ ৪৪
অমৌলিক হাইপ্রেসার ৪৫
হাইপ্রেসারের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ৪৭
হাই ব্লাডপ্রেসারের প্রতিষেধক ব্যবস্থা ৭৬
হাইপ্রেসারের আনুষঙ্গিক চিকিৎসা ৭৯
হাইপ্রেসার রোগীর পথ্য ৮৩

ডায়াবেটিস

ডায়েবেটিস ৮৮
ডায়েবেটিস কি? ৮৮
কি করে রক্তে সুগার জমে? ৯১
সুগার প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হয় কি করে? ৯১
সুস্থ মানুষের প্রস্রাবে চিনি পাওয়া যায় না
কেন? ৯২
মূত্র পর্যবেক্ষন পরীক্ষণ এবং
পরিমান ৯৩
স্বাভাবিক মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৯৩
মূত্রের প্রকৃতি ৯৪
গন্ধ ও স্বাদ ঃ ৯৪
মূত্রে সাময়িক শর্করাধিক্য ৯৪

প্রথম খণ্ড

ব্লাড প্রেসার

প্রথম অধ্যায়

রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া (Blood Circulation)

ব্লাড প্রেসার হল রক্তের চাপ। রক্তের এই চাপের ফলেই রক্ত সারা শরীরে সর্বদা প্রবাহিত হচ্ছে, অন্যথায় রক্ত স্থির থাকত। ব্যষ্টিগত ভাবে প্রত্যেকেরই রক্তের এই চাপের নিজস্ব একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। এই সীমা অতিক্রম করলে তাকে High Pressure বা উচ্চরক্তচাপ এবং যদি স্বাভাবিক সীমার থেকে রক্তের চাপ কম থাকে তবে তাকে লোপ্রেসার বা নিম্নচাপ বলে। হাই প্রেসারে কি ক্ষতি হয় বা লো প্রেসারে কি ক্ষতি হয় ইত্যাদি ব্লাড প্রেসার জনিত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে (Blood Circulatory System) রক্ত সঞ্চালন তন্ত্র ক্রিয়ার মাধ্যম স্বরূপ অঙ্গসংস্থান (Anatomy) এবং শারীরবৃত্তিয় কার্যাবলী (Physiology) সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার বলে এখানে এই সম্পর্কে একটু আলোচনা করব। কিছুদিন আগে সারা ভারতব্যাপী একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ২৫% শতকরা পঁচিশ ভাগ মানুষই এখন উচ্চরক্তচাপ রোগে আক্রান্ত। আরও জানা গেছে যে এই হারের দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে। জগৎবিখ্যাত মনিষীবৃন্দ যথা স্বামী বিবেকানন্দ, বৈজ্ঞানিক এড্‌ওয়ার্ড জেনার, লুইস পাস্তুর, বিখ্যাত নেতা উড্রো উইলসন, ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট, যোসেফ স্ট্যালিন, পণ্ডিৎ জওহরলাল নেহেরু ইত্যাদি বহুসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর মানুষকেই এই রোগের শিকার হয়ে অকালে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছে। কিন্তু পূর্ব্ব থেকে এই রোগ সম্পর্কে সচেতন থাকলে এবং যথাসময়ে উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাদের আর অকালে প্রাণত্যাগ করতে হত না। উচ্চশ্রেণীর মহামানবগণের অকালমৃত্যুতে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয় তা আর কস্মিনকালেও পূরণ হয় না। তাই দেশ তথা জাতিকে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে হলে, এই রোগটি সম্পর্কে পূর্ব হতেই জনসাধারণকে সচেতন করা এবং উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান বিতরন করা প্রত্যেক সুচিকিৎসক এবং উচ্চশিক্ষিত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের একটি নৈতিক দায়িত্ব বলে বিবেচিত হওয়া উচিৎ।

রক্ত সঞ্চালন তন্ত্রের অঙ্গসংস্থান ও শারীরবৃত্তিয় কার্য্য (Anatomy and Physiology of Blood Circulatory System)

রক্ত সঞ্চালন তন্ত্র (Blood Circulatory System) যে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে গঠিত তা হল —

১) রক্ত পাম্পিং যন্ত্র হৃৎপিণ্ড (Heart)

২) রক্ত চলাচলের মাধ্যম স্বরূপ—

ক) ধমনী (Artery)

খ) শিরা (Veins)

গ) কৈশিক নালী (Capilaris)

৩) প্রবহমান রক্ত (Blood)

৪) লসিকা প্রণালী (Lymphatic System) (এরা টিসুরস সংগ্রহ করে রক্তে ঢেলে দেয়)

হৃৎপিণ্ড অহরহ রক্ত পাম্প করে চলেছে। সেই রক্ত বিভিন্ন ছোট বড় ধমনী ও কৈশিক নালীর মধ্য দিয়ে শরীরের সকল টিসুকে খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করতে করতে এগোচ্ছে। কৈশিক জালে পৌঁছে রক্ত কার্বনডাই অক্সাইড় তৈরী করে ছোট মাঝারী বড় শিরার মধ্য দিয়ে বয়ে নিয়ে হৃৎপিণ্ডে ফেরৎ পাঠায়। সেখান থেকে রক্ত ফুসফুসে পরিশুদ্ধ হয়ে পুনরায় হার্টে ফিরে আসে। এই ক্রিয়া মিনিটে ৭০ থেকে ৭২ বার হয়।

হৃৎপিণ্ডই হল রক্তের ভাণ্ডার। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ধমনী শিরা ও লসিকা এদের নিয়েই রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া চলছে। হৃৎপিণ্ড থেকে শোধিত রক্ত আর্টারী বা ধমনী দিয়ে শরীরের সর্বস্থানে পরিচালিত হচ্ছে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানের দূষিত রক্ত শিরা (Vein) দ্বারা প্রবাহিত হয়ে আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসছে। এখান থেকে দূষিত রক্ত ফুসফুসে গিয়ে শোধিত হয়। সেই বিশুদ্ধ রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে এসে আবার ধমনী দ্বারা দেহের সর্বত্র চালিত হয়। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ায় ফুসফুস দূষিত রক্ত শোধন করে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বায়ুর মাধ্যমে ফুসফুস অক্সিজেন গ্যাস সংগ্রহ করে। সেই অক্সিজেন দ্বারাই দূষিত রক্ত পরিস্কৃত হয়। সুতরাং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ায় ফুসফুস দূষিত রক্ত শোধন করে আর হৃৎপিণ্ড সারা শরীরে সেই শোধিত রক্ত রসদরূপে যোগান দেয়।

হৃৎপিণ্ড (Heart)

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া (Functions of Heart) ঃ—

শরীরের প্রতিটি কোষাণু, প্রত্যেক তন্তু এবং সমস্ত যন্ত্রে খাদ্য পানীয় এবং অক্সিজেন অবিরত যোগান দেওয়া ও ক্ষয়প্রাপ্ত আবর্জনা শরীর থেকে বের করে দেওয়া—শরীর রক্ষার্থে এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সর্বক্ষণের জন্য পালন করে চলেছে হৃৎপিণ্ড। দিবারাত্রি, বিপদে আপদে রোগে শোকে আজীবন এই পাম্পিং যন্ত্রটি একই ছন্দে একই তালে সমানে কাজ করে চলেছে। একবার কুঞ্চন পরক্ষণেই প্রসারণ, আবার কুঞ্চন ও প্রসারণ—এই ক্রিয়া অহরহই চলছে। এই কারণেই হৃৎযন্ত্রের গঠনভঙ্গিও অনুপম ও বিচিত্র।

হৃৎযন্ত্রের অবস্থান (Anatomical Position of Heart)

বুকের বাম দিক ঘেষে পুরু পেরিকার্ডিয়াম থলীর মধ্যে মাংসল হৃৎপিণ্ডটি, স্টার্নামের পেছনের মিডিয়া স্টাইনামে (ইসোফেগাস) এবং বড় এওর্টা ধমনীর বুকের (থোরাসিক) ভাগ আছে। হার্টের নীচের সূঁচালো অংশকে এপেক্স বলে। বাম বুকের ষষ্ঠ পাঁজরের হাড়ের পাড় বরাবর এবং ডায়াফ্রামের উপরে ওর মধ্য টেণ্ডনের সাথে যুক্ত হয়ে অবস্থিত। হার্টেব উপর অংশকে বেস বলে। এটি স্টার্নাম বক্ষাস্থির বাঁদিকে তৃতীয় পঞ্জরাস্থির নীচের পাড় বরাবর অবস্থিত।

বাইরে থেকে হার্টের অবস্থান নির্ণয়

বুকের উপরে হৃৎপিণ্ডের অবস্থান নির্ণয় করতে হলে কয়েকটি কাল্পনিক রেখা টানতে হবে। এই রেখাগুলোর সাহায্যে সহজেই বাইরে থেকে হার্টের অবস্থান অনুমান করা যেতে পারে। বাম কণ্ঠাস্থির মধ্যবিন্দু থেকে নীচে বাম স্তন পর্যন্ত একটি রেখা টানতে হবে। সুস্থ ও সবল হার্ট সর্বদা ঐ রেখার ভেতরদিকে থাকবে। এই লাইনটি হৃৎপিণ্ডের অবস্থানের বাম সীমারেখা। এবার ডান বক্ষের তৃতীয় পঞ্জরাস্থি যেখানে স্টার্নামে সংযুক্ত হয়েছে তার কোয়ার্টার ইঞ্চি ডানদিকে একটি বিন্দু অঙ্কন করতে হবে। আর ঐ দক্ষিণ বুকের নীচে ষষ্ঠ পঞ্জরাস্থির এক ইঞ্চি দূরে একটি বিন্দু একে একটি রেখা টানতে হবে। এখন যে লাইনটি পাওয়া গেল সেটি হার্টের দক্ষিণ দিকের অবস্থান সীমারেখা। এখন দুইদিকের দুইটি লাইনের প্রান্তবিন্দু যোগ করলে হার্টের বেস ও এপেক্সের অবস্থান সীমাও কতকটা অনুমান করা যাবে।

হৃৎযন্ত্রের শারীরবৃত্তিয় কার্য্য (Physiological function of Heart)

হার্টের চারটি কক্ষ রয়েছে, বামদিকে দুটি ও ডানদিকে দুটি। বামদিকের কামরা দুটির সঙ্গে ডানদিকের কামরাদ্বয়ের যোগাযোগ নাই। দুটি এট্রিয়াম (অলিন্দ) ও দুইটি ভেন্ট্রিকেল (নিলয়) এই চারটি কামরা নিয়ে হৃৎপিণ্ডটি গঠিত। দক্ষিণ এট্রিয়াম থেকে দক্ষিণ ভেন্ট্রিকেলে যাবার দরজাকে ট্রাইকাস্পিড় ভালভ্ বলে, কারণ ওতে তিনটি কপাট আছে। বাঁদিকের এট্রিয়াম থেকে বাম ভেন্ট্রিকেলে যাবার দরজাকে মাইট্রাল ভালভ্ বলে;এর দুটি ভালভ্ বা কপাট। দুইটি এট্রিয়ামই পাতলা, ভেন্ট্রিকেল অপেক্ষা আকারে ছোট, নীচের দিকটা কিছুটা স্থূল ও মাংসল (এদের বাইরের দেয়ালে কানের মত একটা করে ছোট থলি (পাউচ) আছে তাকে অরিকল বলে। জন্মাবার আগে পর্যন্ত দুই এট্রিয়ামে যোগাযোগ থাকে, কিন্তু জন্মের পরে তা বন্ধ হয়ে যায়, একটা গর্তের চিহ্ন শুধু বর্তমান থাকে তাকে বলে ফসা ওভালিস।

ভেন্ট্রিকেল বা নিলয় দুটিই খুব পুরু মাংসপেশীর দ্বারা গঠিত। বাম ভেন্ট্রিকেল ডানদিকের চেয়েও আরও অধিক শক্তিশালী ও পোক্ত, কারণ ওখান থেকে বিরাট এওর্টা ধমনী বেরিয়েছে, যার ভেতর দিয়ে হার্টকে পাম্প করে সারা দেহে রক্ত পাঠাতে হয়। দক্ষিণ ভেন্ট্রিকেল থেকে পাল্মনারি ধমনী বের হয়ে দুই ফুসফুসে গেছে। এই দুই ধমনীর মুখে যে কপাট আছে, তাতে তিনটি করে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাট আছে তাদের বলা হয় সেমিলুনার ভালভ্।

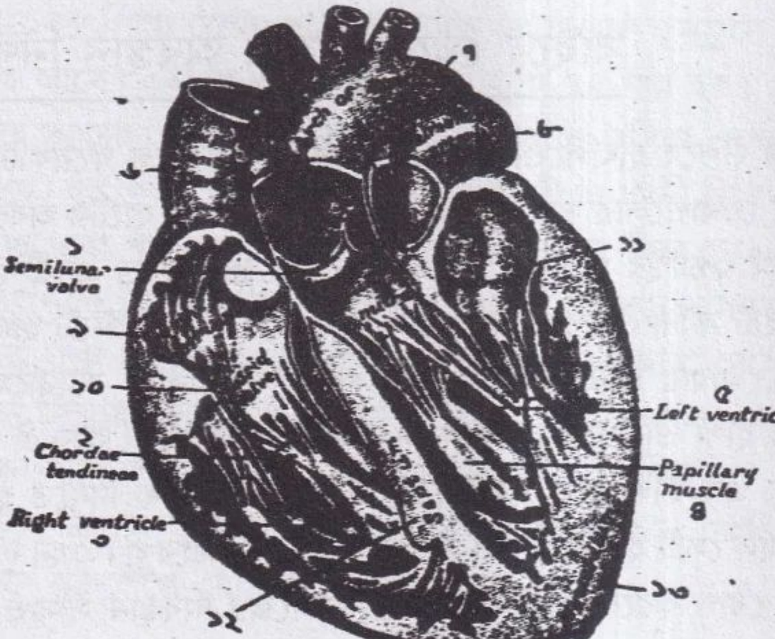

চিত্র-১৭২। হার্টের অভ্যন্তর, সম্মুখ দৃশ্য।
১। সেমিলুনার ভাল্‌ভ, ২। কর্ডি টেন্ডিনি, ৩। দক্ষিণ ভেন্ট্রিকেল, ৪। প্যাপিলারি মাস্‌ল, ৫। বাম ভেন্ট্রিকেল, ৬। সুপিরিয়র ভেনাকাভা, ৭। এওর্টার আর্চ, ৮। পাল্মনারি ধমনী, ৯। দক্ষিণ এট্রিয়াম, ১০। ট্রাইকাস্পিড ভাল্‌ভ, ১১। মাইট্রাল ভাল্‌ভ, ১২। সেপ্টাম, ১৩। মায়োকার্ডিয়াম।

অলিন্দ অপেক্ষা নিলয়ের কামরা বড়। অলিন্দে প্রায় দুই আউন্স এবং নিলয়ে চার থেকে ছয় আউন্স পরিমান রক্ত ধরে। ডান অলিন্দ থেকে একটি বড় শিরা বেরিয়েছে এর নাম মহাশিরা বা ভেনা কেভা (Vena Cava)। ওপরের দিকে যে অংশ গেছে তাকে সুপিরিয়র ভেনাকেভা এবং নীচের দিকের অংশকে ইনফিরিয়র ভেনাকেভা বলে। শরীরের যাবতীয় দূষিত রক্ত এই ভেনাকেভা দিয়ে হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে এসে পড়ে। শরীরের উর্দ্ধদিকের দূষিত রক্ত সুপিরিয়র ভেনাকেভা দ্বারা এবং নিম্নদিকের রক্ত ইনফিরিয়র ভেনাকেভা দ্বারা ডান অলিন্দে এসে পড়েছে। ডান অলিন্দ থেকে দূষিত রক্ত আবার ডান নিলয়ে যাচ্ছে। এইজন্য অলিন্দ এবং নিলয়ের মধ্যে একটা দরজা আছে। এই দরজার নাম দক্ষিণ অরিকুলো ভেন্ট্রিকুলার দ্বার। এই দ্বারটি ট্রাইকাসপিত ভালভ্ নামক পর্দা বা কপাট ত্রয় দ্বারা রক্ষিত হচ্ছে। নিলয় যখন রক্তপূর্ণ হয় তখন ঐ কপাট বন্ধ হয়ে যায় যাতে রক্ত আবার অলিন্দে ফিরে যেতে না পারে। ডান নিলয় থেকে অপরিশুদ্ধ রক্ত পালমোনারী আর্টারী বা ফুসফুসীয় ধমনী দ্বারা দুইটি ফুসফুসে গিয়ে শোধিত হয়। ঐ রক্ত ফুসফুসে অক্সিজেন দ্বারা শোধিত হলে দুইটি ফুসফুস থেকে উদ্ভূত পালমোনারী ভেন সেই রক্ত বহন করে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে ঢেলে দেয়। অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যে যে কপাট দ্বার রয়েছে ঐ দরজা দিয়ে বাম অলিন্দ থেকে শোধিত রক্ত বাম নিলয়ে পৌঁছলে কপাট বন্ধ হয়ে যায় এবং বাম নিলয় থেকে শোধিত রক্ত বৃহৎ ধমনী বা এওর্টা নামক বড় ধমনী দিয়ে শরীরের সর্বত্র তা পরিচালিত হয়। বাদিকের অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যস্থ দ্বারকে বাম অরিকুলো ভেন্ট্রিকুলার দ্বার বলে—মাইট্রাল ভালভ্ নামক পর্দা বা কপাটদ্বয় দ্বারা এটি রক্ষিত হয়। যখন ডানদিকের নিলয়ের সঙ্কোচন ঘটে তখন ঐ একই সময়ে সঙ্গে সঙ্গে পালমোনারী আর্টারীর কপাটত্রয় খুলে যায় এবং এদের মধ্য দিয়েই ফুসফুসে রক্ত প্রবেশ করে, আর ঠিক এই সময়ে বাম নিলয়ও সঙ্কুচিত হয়। মাইট্রাল ভালভ্ তাদের নিজ দ্বার বন্ধ করে দেওয়াতে এবং এওর্টার ভালভ্ খুলে যাওয়ায় এওর্টার মধ্যে শোধিত রক্ত প্রবেশ করে দেহের বিভিন্ন অংশে চলে যায়। এরপর আবার নিলয় দুইটি প্রসারিত হতে আরম্ভ করলে এওর্টা ও পালমোনারী আর্টারী উভয়েই তাদের নিজ নিজ দ্বার বন্ধ করে দেয় এবং মাইট্রাল ট্রাইকাসপিড্ দ্বার এই একই সময়ে খুলে যায় ও দুইদিকের নিলয় একই সময়ে প্রসারিত এবং একই সময়ে সঙ্কুচিত হয়। এই সঙ্গে দুইদিকের নিলয়ের দ্বারও অর্থাৎ ট্রাইকাসপিড ও মাইট্রাল ভালভের দ্বার একই সময়ে বন্ধ হয় এবং পালমোনারী আর্টারী ও এওর্টার দ্বার খুলে যায়। একই সময়ে এই দ্বার দুটি বন্ধ হলে পুনরায় অলিন্দ-নিলয় দ্বার খুলে নিলয় দুটি প্রসারিত হতে থাকে। কোন এক অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে এই কার্য সুচারুরূপে ও সুশৃঙ্খলভাবে অহর্নিশি চলছে। যখন এই সুশৃঙ্খলতার ব্যাঘাত ঘটে তখন অনুমান করতে হবে যে হৃৎপিণ্ডের কোন ক্রিয়া ব্যাঘাত উপস্থিত হয়েছে।

হৃৎপিণ্ডের অন্তর্নিহিত শক্তি (Internal power of Heart)

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে দেখা গেছে যে একটি জীবন্ত পশুদেহ থেকে হার্ট কেটে নিয়ে যদি ৯৮° তাপের লবন জলে ডুবিয়ে অক্সিজেন গ্যাস সরবরাহ করে রাখা হয় তবে কয়েক ঘন্টা তার কুঞ্চন প্রসারণ ক্রিয়া অব্যাহত থাকে। রাশিয়ার এক দেহ তত্ত্ববিদ হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া একটি মানুষের হার্টকে ঐভাবে রক্ত ও টিসুরস সরবরাহ করে কয়েকমাস পর্যন্ত ক্রিয়াশীল রেখেছিলেন। এর থেকে জানা গেছে যে হার্টের চলার বেগ ও প্রেরণা ঐ যন্ত্রের মধ্যেও নিহিত রয়েছে। এর জন্যই বর্তমানে সদ্য মৃত কোন ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড নিয়ে অন্য ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তে স্থাপন করা সাফল্যের সঙ্গে সম্ভব হচ্ছে।

হৃৎপিণ্ডের শব্দ (Heart Sound)

হার্টের দুই অংশের মধ্য ব্যবধানকে সেপ্টাম বলে। ঐ স্থানে মাংসের একগোছা ফাইবার রয়েছে, যা দেখতে মাংস হলেও নার্ভটিসুর কাজ করে, অর্থাৎ এদের ভেতর দিয়েই হার্টের প্রেরণা চলাচল করে।

দক্ষিণ এট্রিয়ামের কক্ষে যেখানে সুপিরিয়র ভেনাকেভার মুখ, তার নীচে সাইনো এট্রিয়াল নোড (কড়া মত) রয়েছে **S. A. Node**. এইটি করোনারী সাইনাসের স্থান, যা থেকে বাণ্ডল অফ্‌হিস বেরিয়েছে। এই বাণ্ডল (গোছা) কতক এট্রিয়াম কক্ষের, আর বাকি ভেন্ট্রিকেল কক্ষের সেপ্টামে প্রবেশ করে দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে এবং সেখান থেকে ওরা সারা হৃৎপিণ্ডে জালের মত সূক্ষ্ম নার্ভগুচ্ছ পার্কিজি ফাইবার্স হয়ে ছড়িয়ে গেছে।

S. A. Node অর্থাৎ সাইনো এট্রিয়াম নোড থেকে হৃৎস্পন্দন শুরু হয় ঃ—হৃৎ ব্যাটারীর প্রথম স্পার্ক (প্রেরণা) এইখানে জন্মে। এই নোডের আদেশে স্পন্দন সহজ, মন্দ বা দ্রুত হয়। এই নোড্ যদি উবড়ে ফেলা হয়, তবে কিছুক্ষণের জন্য স্পন্দন থেমে গিয়ে আবার চলে, তখন এট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোড স্পন্দন ক্রিয়া চালাতে থাকে। প্রতি হৃৎস্পন্দন আরম্ভ হওয়ার আগে এই সাইনো এট্রিয়াম নোড কুঁচকায়, সঙ্গে সঙ্গে ঐ কুঞ্চনক্রিয়া দুই ভেনাকেভার মুখ ও এট্রিয়াম কক্ষের পেশীসমূহে ছড়িয়ে এট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোডে পৌঁছায়। সেখান থেকে পার্কিঞ্জি ফাইবার্স দিয়ে দুই ভেন্ট্রিকেল পেশীতে ছড়িয়ে যুগপৎ সমস্ত মাংসপেশী কুঁচকিয়ে দেয়। যদি S. A. Node ঠিক থাকে, কিন্তু A. V. Node (এট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার) বিগড়ে যায়, তবে হার্ট ব্লক জন্মে। এই অবস্থায় যদিও এস. এ. নোড্ থেকে প্রেরণা ভেন্ট্রিকেলে যায় না, তবু ভেন্ট্রিকেলের সহজাত শক্তির সাহায্যে সে কুঞ্চিত হয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত মন্দগতিতে স্পন্দন ক্রিয়া চলে।

হৃৎস্পন্দন (Cardiac Cycle) ঃ আমাদের বিশ্রামকালে প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দন গড়ে ৭৫ বার হয়। কুঞ্চন এট্রিয়ামে আরম্ভ হয়ে ১/১০ সেকেণ্ড থাকে। কুঞ্চনের ফলে সমস্ত

এট্রিয়াম কক্ষ রক্তশূন্য হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভেন্ট্রিকেলদ্বয় কুঁচকায়, তা থাকে ৩/১০ সেকেণ্ড, একে সিস্টোল বলে। এরপর সমস্ত হৃৎপিণ্ড প্রসারিত হয়ে ৪/১০ সেকেণ্ড থাকে, একে বলে ডায়াস্টোল। মোট একটি হার্টবিট ৮/১০ সেকেণ্ড সময় নেয়।

সিস্টোল-ডায়াস্টোল অর্থাৎ কুঞ্চন প্রসারণ অবস্থায় হার্টের কক্ষে কি ক্রিয়া চলে? সিস্টোল অবস্থায় ডানদিকের এট্রিয়াম কক্ষে, দুই ভেনাকেভা দিয়ে যত কাল রক্ত আসে, তা সব চলে যায় দক্ষিণ ভেন্ট্রিকেলে, এবং সেখান থেকে পাল্মনারি আর্টারি দিয়ে ফুসফুসে যায়। এই সময় বাম এট্রিয়াম থেকে যে তাজা রক্ত পাল্মনারি ভেন দিয়ে বাম ভেন্ট্রিকেলে আসে, তা বৃহৎ এওর্টা ধমনী দিয়ে সারা দেহে প্রেরিত হয়। দুই ভেন্ট্রিকেলের কুঞ্চনক্রিয়া বিদ্যুৎগতিতে হয়। এট্রিয়াম থেকে রক্ত এসে দুই ভেন্ট্রিকেলের কক্ষে চাপ খুব বাড়িয়ে দেয়। মাইট্রাল ও ট্রাইকাস্পিড (এট্রিয়ামে যাবার পথ) দরজা এটে বন্ধ থাকে। যখন এট্রিয়াম দুটি সঙ্কুচিত হয় ঠিক সেই মুহূর্তে ভেন্ট্রিকেল দুটি শিথিল থাকে। আর ভেন্ট্রিকেল যখন সঙ্কুচিত হয় তখন এট্রিয়ামরা শিথিল হয়। ডায়াস্টোলের সময় চার কামরাই রক্তে ভরে যায়। ভালভ থাকার জন্য ঐ রক্ত পেছনে যেতে পারে না। এট্রিয়াম শিরামুখে কপাট নাই। শিরাতে রক্ত ভর্তি থাকে এবং সেই রক্ত পেছনে যেতে পারে না, শিরা মধ্যে যে ভালভ্ আছে সেখানে আটকে যায়।

এখন চাপের কথায় আসা যাক। যেই মুহূর্তে এক হার্ট বিট শেষ হল, ভেন্ট্রিকেল দুটি প্রসারিত হয়ে রয়েছে, ওদের কক্ষে মাত্র ২/৩ মিলিমিটার চাপ আছে, তাই এট্রিয়াম থেকে টুপিয়ে টুপিয়ে রক্ত এসে পড়ছে। এওর্টা ও পাল্মনারী ধমনীর দরজা বন্ধ আছে। ওদের মধ্যে ৭০ মিলিমিটারের অধিক চাপ বর্তমান। অতএব যতক্ষণ দুই ভেন্ট্রিকেলেও ৭০/৮০ মি.মি. চাপ না জন্মে ততক্ষণ ধমনী দুটির কপাট খোলে না। সেইজন্য ভেন্ট্রিকেলে রক্ত জমে জমে, সিস্টোল প্রায় শেষ সময়ে, যখন চাপ খুব বেশী হয়, তখনি ধমনীদ্বয়ের কপাট খুলে রক্ত বেগের সঙ্গে ঢুকে পড়ে। রক্ত বেরিয়ে গেলে ভেন্ট্রিকেলের চাপ কমে যায়, ধমনীর কপাটও বন্ধ হয়ে যায়। তাই দুই ভেন্ট্রিকেল, এট্রিয়ামের ন্যায়, একেবারে রক্তশূন্য হয়ে চুপসে যায় না, কিছু রক্ত ওদের কক্ষে সর্বদা থাকেই। সিস্টোলের সময়ে বাম এট্রিয়াম কক্ষের চাপ কিছু বেশী থাকে, কিন্তু দক্ষিণ এট্রিয়ামের মধ্যে চাপ কখনও বেশী হয় না। কারণ দুই ভেনাকেভার ভাণ্ডারে রক্ত সর্বদা ভর্তিই থাকে।

হার্টের লাবডাব শব্দের উৎস

বুকে স্টেথোস্কোপ বসালে কিংবা কান পাতলে পরপর দুটি শব্দ ও তারপর একটু বিরাম, আবার ঐ রকম লাবডাব শব্দ ও বিরাম বেশ ভালভাবেই অনুভব করা যায়। সিস্টোল কালে লাবডাব, এবং ডায়াস্টোল কালে বিরাম এই ক্রিয়া অহরহ চলছে। লাব শব্দের উৎপত্তির কারণ, হঠাৎ মাইট্রাল ও ট্রাইকাস্পিড্ দুই দরজা বন্ধ হওয়া, এট্রিয়াম ও